হাসানআল আব্দুল্লাহ

বাংলা ছন্দের ধারাবাহিক বিকাশ

শ্রুতি মাধুর্য নির্মাণে শব্দের পরিশীলিত ও পরিমার্জিত ব্যবহার বাক্য বিন্যাসে যে দোলা বা ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তার নাম ছন্দ। বুনন ও উচ্চারণের তারতম্যে নির্মিত শব্দ-স্রোত আবার নানা রকম আবহ তৈরী করে, বাংলায় যাদের বলা হয় স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। পয়ার, অমিত্রাক্ষর, মন্দাক্রান্তা, মহাপয়ার ইত্যাদিও এই তিন ছন্দের সম্প্রসারিত ফলাফল। বাংলা ছন্দ, যার উৎপত্তি ভাষার জন্মলগ্ন থেকে এবং প্রথম লেখ্য রূপের নিদর্শন চর্যাপদে, তার ক্রম-বর্ধমান বিকাশ ঘটে পাঁচালী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মৈমনসিংহ-গীতিকা তথা মধ্যযুগের হাত ধরে ক্লাসিক্যাল বা মহাকাব্যিক ও রোমান্টিক পর্যায়ের ভেতর দিয়ে আধুনিক ও উত্তরাধুনিক কালে।

মনে রাখা দরকার যে একেক ভাষার ছন্দ একেক রকম। কারণ প্রত্যেক ভাষারই স্বতন্ত্র উচ্চারণ রীতি আছে। এই রীতি মেনেই ছন্দ বিকশিত হয়। তবে ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে স্বরবৃত্ত ছন্দ বা এই ধরনের উচ্চারণ মাধুর্য, ইংরেজীতে যা অনেকটা আয়াম্বিক ছন্দের মতো, সব ভাষায়ই তার উৎপত্তির সাথে বেড়ে ওঠে। কথা বলা, ছড়া কাটা, শ্লোক তৈরী ও স্বগত উচ্চারিত গান ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এটি অনেকটাই অনায়াসলব্ধ।

ক্রমোন্নতি এবং বিকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বাংলা ছন্দের বিকাশকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা যায়:

১। আদি পর্ব
২। মধ্যযুগীয় পর্ব
৩। ক্লাসিক্যাল পর্ব
৪। রোমান্টিক পর্ব
৫। আধুনিক ও উত্তরাধুনিক পর্ব

আদি পর্ব:

এই পর্বের ছন্দ নিয়ে আলোচানার আগে যাঁর কথাটি উঠে আসে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কারণ তিনিই চর্যাপদের আবিষ্কারক। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি উদ্ধার প্রকল্পের আওতায় ১৯০৭ সালে তৃতীয় বারের মতো তিনি নেপাল যান। এ পর্যায়ে যে কয়খানা পুঁথি তিনি খুঁজে পান তার একটির নাম "চর্যাগীতিকোষ"। তিনি বলেন, "উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম চর্যাপদ।" ১৯১৬ সালে এইসব খুঁজে পাওয়া পুঁথি দিয়ে তিনি যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তার নাম "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা"। এই গ্রন্থেই "চর্যাগীতিকোষ"-এর কবিতাগুলো সংযোজিত হয় "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" নামে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য পদগুলির নামেই এইসব কবিতা পরিচিতি পায়। অর্থাৎ চর্যাপদই হয়ে ওঠে এ যাবত পাওয়া বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থবদ্ধ নিদর্শন। রচিত প্রতিটি পদের উপরে ছিলো নির্দিষ্ট রাগের উল্লেখ। ধারণা করা হয়, এগুলো মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনার গান। কথিত আছে বৌদ্ধ আচার্যরা সাধারণ মানুষের জন্য ধর্ম প্রচার করতেন। অতএব তাঁদের ভাষা অর্থাৎ চর্যাপদের ভাষা অনেকাংশেই সাধারণ লোকের মুখের ভাষা বলে প্রতিষ্ঠা পায়। এগুলি যে বাংলায় রচিত তার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অসমীয়া উড়িয়া ও মৈথিলী ভাষার বিশ্লেষকেরা মনে করেন যে এই পদগুলি তাদের ভাষারই আদি রূপ। তবে সুখের কথা হলো চর্যাপদের রচনাকাল, আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ অব্দে উল্লিখিত অন্যান্য ভাষা বিকাশের তেমন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "সমস্তই বাংলা বলিয়া বোধ হয়"কে শিরোধার্য করে চর্যাপদকে বাংলায় রচিত কবিতার লিখিত প্রথম নিদর্শন হিসেবে মেনে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়।

চর্যাপদের ছন্দ বিশ্লেষণ বেশ দুরূহ কাজ। কারণ তখনো বাংলা ছন্দের আঁটোসাঁটো রূপ ফুটে ওঠেনি। তবে, বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভাব থাকার ফলে ধারণা করা হয় যে ওই ভাষাদ্বয়ের তখনকার প্রচলিত ছন্দ, প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত, প্রাথমিক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এ-ও অসম্ভব নয় যে বহুকাল কবিতার কথ্যরীতির প্রচলন থাকায়, বাংলা কথ্য ভাষার সাথে ওইসব ভাষার প্রভাব একত্রিত হয়ে শব্দবন্ধের স্রোত বা দোলা আলাদা রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে এই পর্বের কবিরা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসায়, ওইসব মানুষের সাহচর্যে লৌকিক ছন্দ স্বরবৃত্তের সাথে প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণে দানাকৃত হয় এক নতুন ছন্দ, যার নাম মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত। ফলতঃ চর্যাপদে যেমন স্বরবৃত্তের আভাস মেলে,

প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের চাল পাওয়া যায়, তেমনি অক্ষরবৃত্তের পয়ারও দেখা যায়। অন্যদিকে ধর্মীয় আচার যাপন যদিও চর্যার বিশেষ প্রতিপাদ্য ছিলো, তথাপি সাহিত্যের প্রাণ চঞ্চলতায় পদগুলি পরিপূর্ণ।

সাতটি দীর্ঘধ্বনি যেমন, আ ঈ ঊ এ ও ঐ ঔ প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মাত্রা সম্প্রসারণের কাজ করতো। অর্থাৎ এদের প্রত্যেককে দুই মাত্রার মূল্য দেয়া হতো। সাথে সাথে যুক্তাক্ষরজনিত বদ্ধস্বরকেও দুই মাত্রা দেয়ার প্রচলন ছিলো। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে যেমন এই নীতিমালা আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে, তেমনি বাংলায় এই নিয়ম ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা চর্যাপদের কালেই শুরু হয়।

১.
আলে গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত কাহিব কীস।।
(কাহ্নুপাদ)

আধুনিক উচ্চারণকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে এই পঙ্‌ক্তি দু'টি রচিত হয়েছে স্বরবৃত্তের দু'টি করে নির্ভুল পর্ব দিয়ে। "সীস" এর সাথে "কীস" এর নিখুঁত অন্ত্যমিলও রাখা হয়েছে।

পর্ববিন্যাস:

আলে গুরু/ উএসই সীস।/
বাকপথাতীত/ কাহিব কীস।।/

কাঠামো:
৪ + ৪
৪ + ৪

এমন নিখুঁত ছন্দ রীতি অবশ্য এই কবিতাটির সর্বত্র বিরাজিত নয়। তবে ছন্দটিকে এর ভেতর দিয়ে দানাকৃত হতে দেখা যায়। পুরো কবিতাটি পড়া যাক।

জো মনগোএর আলাজাল।
আগম পোথী ইষ্টামালা।।
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।
কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ।।
আলে গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত কাহিব কীস।।
জেতবি বোলী তেতবি ঢাল।
গুরু বোক সে সীসা কাল।।
ভণই কাহ্ন জিণরঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।।

পর্ববিন্যাস:

জো মনগোএর/ আলাজাল।/
আগম পোথী/ ইষ্টামালা।।/
ভণ কইসেঁ সহজ/ বোলবা জাঅ।
কাঅ বাক চিঅ/ জসু ণ সমাঅ।।
আলে গুরু/ উএসই সীস।/

বাকপথাতীত/ কহিব কীস।।/
জেতবি বোলী/ তেতবি ঢাল।
গুরু বোক সে/ সীসা কাল।।
ভণই কাহ্ন জিণ/ রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবো/ হিঅ জইসা।।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও অষ্টম এই চার পঙ্‌ক্তি স্বরবৃত্তের মতো মনে হয় না। আলোচনার সুবিধার্থে এদের আলাদা করে নেয়া যাক।

ভণ কইসেঁ সহজ/ বোলবা জাঅ।
কাঅ বাক চিঅ জসু/ ণ সমাঅ।।
ভণই কাহ্ন জিণ/রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবো/হিঅ জইসা।।

এদের অনেকটা অক্ষরবৃত্তের (পয়ার) আট-ছয় মাত্রার বুনন বলে ধরা যায়, যদিও প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বটিতে ছয় মাত্রা সংযোজিত হয়নি। তবে বহুদিন ধরে ছন্দবিশারদগণ যে চিন্তাটি করে আসছেন তার ভিত্তিতে তৃতীয় লাইনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ভণই কাহ্ন জিণ/রঅণ বি কইসা।

আমরা যদি ধরে নেই যে "কাহ্ন" শব্দটি তিনমাত্রা এবং "রঅন" শব্দটি দুই মাত্রা ধারণ করেছে, তাহলে এই পঙ্‌ক্তিটি অনায়াসে আট-ছয় পর্বের পয়ার তৈরী করে। আদতে ঘটনাটিও তাই ঘটেছে। দীর্ঘধ্বনি ও যুক্তাক্ষর জনিত বদ্ধস্বর (যাকে দীর্ঘধ্বনির আওতায় আনা হয়) প্রসারণ ও হ্রস্বধ্বনির সংকোচন। যেহেতু "কাহ্ন" শব্দের "কান" যুক্তাক্ষর জনিত দীর্ঘধ্বনি, একে দেয়া হয় দুই মাত্রা; (তবে চর্যাপদের সময় "কান" বা এই জাতীয় বদ্ধস্বরকে আলাদা করার প্রচলন শুরু না হওয়ায় "হ্ন"কে-ই দু'মাত্রা দেয়া হতো।) অন্যদিকে "রঅণ" শব্দের মাঝে "অ" হ্রস্বধ্বনি, একে সম্পূর্ণ ভাবে সংকোচন করে "রঅণ"কে দেয়া হয়েছে দুই মাত্রা। অর্থাৎ "ভণই কাহ্ন জিন"=আট; এবং "রঅণ বি কইসা"=ছয়। যদিও এই চার পঙ্‌ক্তির সর্বত্র এই নিয়ম সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়নি, তথাপিও চর্যাপদের পয়ার তৈরীতে দীর্ঘধ্বনির প্রসারণ ও হ্রস্বধ্বনির সংকোচন ছিলো একটি গ্রহণযোগ্য উপায়।

২.
উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো না কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
(শবরপাদ)

পর্ববিন্যাস:

উঁচা উঁচা/ পাবত তহিঁ/ বসই সবরী/ বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ/ সবরী গীবত গুঞ্জরী/ মালী।।
উমত সবরো/ পাগল সবরো/ না কর গুলী/ গুহাডা তো/হৌরি।

প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি স্বরবৃত্তের মতো, কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিকে মনে হয় অক্ষরবৃত্তে (পয়ারে) রচিত। সেক্ষেত্রে আট-আট-দুই কিম্বা আধুনিক কালের আট-দশ এর বুনন হিসেবে ধরে নিলে সমস্যা এই যে প্রথম পর্বে নয় মাত্রা ও দ্বিতীয় পর্বে এগার মাত্রা পাওয়া যায়। কিন্তু সংকোচন ও প্রসারণের নিয়মে দেখলে "পরহিণ" শব্দের হ্রস্বধ্বনি "হি"কে সংকুচিত এবং "গুঞ্জরী" শব্দের দীর্ঘধ্বনি "গুণ" কিম্বা মতান্তরে "ঞ্জ"-এর মাত্রা বাড়িয়ে শব্দ দু'টিকে যথাক্রমে তিন ও চার মাত্রা ধারণের ক্ষমতা দেয়া হলে উত্থিত সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। "মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ"=আট; এবং "সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী"=দশ।

অন্যদিকে সবগুলো দীর্ঘধ্বনির প্রসারণ ও হ্রস্বধ্বনি সংকোচন হলে দাঁড়ায়:
('-' দিয়ে প্রসারণ ও '[ ]' দিয়ে সংকোচন দেখানো হলো।)

উঁচা- উঁচা- পা-বত তহিঁ/ বসই সবরী- বা-লী-। ১২+১১
মোরঙ্গি- পী-চ্ছ- পর[হি]ণ/ সবরী- গীবত গুঞ্জ-রী- মা-লী-।। ১২+১৬
উমত সবরো- পা-গল সবরো-/ না কর গুলী- গুহা-ডা- তো-হৌ-রি। ১৫+১৬

পঙ্‌ক্তি শেষে মাত্রা সংখ্যা দেখানো হয়েছে, যা কোনো অবস্থাতেই যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না। অতএব এই কবিতাটি প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে রচিত নয়। চলতি বাংলার সাথে সংস্কৃত ছন্দের মিল রেখে, কখনো মেনে, কখনো উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে যে কবিতা রচনা করা হয়েছে সেখানে সংকোচন প্রসারণের নিয়ম সর্বদা মানা হয়নি। তাছাড়া একই কবিতার সব পঙ্‌ক্তিতে একই ছন্দ প্রয়োগের চেষ্টাও হয়তো অনেকটা শিথিল ছিলো। তবে পরপর দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দ একই রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

৩.
তিঅড্ডা চাপী জৌইণি দে অঙ্কবালী।
কমলকুশিল ঘাণ্টি বরহু বিআলী।।
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো হুম চুম্বী কমলরস পীবমি।।
(গুণ্ডরীপাদ)

পর্ববিন্যাস:

তিঅড্ডা চাপী জৌইণি/ দে অঙ্কবালী।
কমলকুশিল ঘাণ্টি/ বরহু বিআলী।।
জোইনি তঁই বিনু খ/ নহিঁ ন জীবমি।
তো হুম চুম্বী কম/ লরস পীবমি।।

পঙ্‌ক্তিগুলিতে দীর্ঘধ্বনির প্রসারণ ও হ্রস্বধ্বনির সংকোচন ক্রিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে আট-ছয় এর চমৎকার পয়ার নির্মিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে

সংকুচিত হয়েছে:

তিঅড্ডা	শব্দে অ	১ম পঙ্‌ক্তি
জৌইণি	শব্দে ই	১ম পঙ্‌ক্তি
জোইনি	শব্দে ই	৩য় পঙ্‌ক্তি

প্রসারিত হয়েছে:

তিঅড্ডা	শব্দে ড্ড	১ম পঙ্‌ক্তি
জৌইণি	শব্দে জৌ	১ম পঙ্‌ক্তি
অঙ্কবালী	শব্দে ঙ্ক	১ম পঙ্‌ক্তি
চুম্বী	শব্দে ম্বী	৪র্থ পঙ্‌ক্তি

লক্ষণীয়, "তিঅড্ডা" ও "জৌইনি" শব্দের সংকোচন ও প্রসারণের পরেও প্রত্যেকেই তিন মাত্রা বহন করার ক্ষমতা পেয়েছে; কিন্তু এই প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে প্রত্যেক অক্ষরকে একমাত্রা করে দিলেও এই ফল পাওয়া যায়। সম্ভবত এই চিন্তা থেকেই পরবর্তী কালে অক্ষরবৃত্তের মাত্রা গণনার রীতি সম্পূর্ণ ভাবে দানা বাধে। তাছাড়া সব দীর্ঘধ্বনির প্রসারণ না ঘটিয়ে শুধু যুক্তাক্ষর জনিত দীর্ঘধ্বনির প্রসারণ বোধ করি এখান থেকেই শুরু হয়।

৪.
ধামার্থে চাটিল/ সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামিলোঅ/ নিভর তরই।।
...
পুচ্ছতু চাটিল/ অনুত্তরসামী।।
(চাটিল্যপাদ)

পয়ারে ছয়-ছয় এর চাল। ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে ছয় মাত্রার এই প্রথম পর্বগুলি কালক্রমে অক্ষরবৃত্তের আটমাত্রা এবং অবস্থা বিশেষে মাত্রাবৃত্তের ছয় মাত্রায় পরিণত হয়েছে।

৫.
এক সো পদমা চৌসঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচ অ ডোম্বী বাপুড়ী।।
(চর্যাপদ-১০)

প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে বিন্যাস:

এ-ক সো পদমা-/ চৌসঠ্ঠী- পাখুড়ী-।
তহিঁ চড়ি না-চ অ/ ডো-ম্বী- বাপুড়ী-।।

প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে আট-আট এর চাল। '-' দিয়ে মাত্রা প্রসারণ বুঝানো হয়েছে। আট-আট এর এই বুননকে প্রাকৃত ছন্দে পাদকুলক বলা হতো। তবে এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে চলতি বাংলার মিশ্রণজনিত উচ্চারণের প্রভাব পাওয়া যায়। প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের সাথে কথ্যভাষার (স্বরবৃত্তের) মিলন মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের পথ খুলে দিতে থাকে।

৬.
অধরাতি ভর/ বিকসিউ।
বতস জোইণি তসু/ অঙ্গ উহ্নসিউঃ।।
(ভুসুকুপাদ)

সংকোচন প্রসারণের ধারা না মেনে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি অক্ষরবৃত্তের আট-ছয় হলেও প্রথম পঙ্‌ক্তি রচিত ছয়-চার মাত্রার পর্বে। অবশ্য প্রথম পঙ্‌ক্তিটি স্বরবৃত্তের চার-চার এবং মাত্রাবৃত্তের ছয়-চার ধরে নিলেও অসুবিধে হয় না, যদিও মাত্রাবৃত্তের নতুন চাল পরিপূর্ণ হতে অনেকগুলো শতাব্দী লেগে যায়।

৭.
আলিএঁ কালিএঁ/ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন/ বিমলা ভইলা।।
(কাহ্নপাদ)

"রুন্ধেলা"কে "রুনধেলা" এবং "কাহ্ন"কে "কানথো" হিসেবে প্রসারিত করে প্রতি পর্বে ছয় মাত্রার চাল আনা হয়েছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে লৌকিক স্বরবৃত্ত ও প্রাকৃত প্রভাব যুক্ত প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণে অক্ষরবৃত্তের পয়ারগুলো চর্যাপদে দানাকৃত হয়ে উঠছিলো। মাত্রার সংকোচন ও প্রসারণের মতো কৌশলী চিন্তাও ধারণ করেছিলেন ওই সময়ের কবিরা। যদিও বেশ কিছু ত্রুটিপূর্ণ বুনন চোখে পড়ে, তথাপি অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে এই পর্বের কবিরা ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। "জালা-মালা", "সীস-কীস", "বালী-মালী", "গঢ়ই-তরই", "কইসা-জইসা", "মোহে-বোহে" ও "জুঝঅ-বুঝঅ" ইত্যাদি মিল

তৈরীর মাধ্যমে তাঁদের মেধাসম্মত চর্চার উৎকৃষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। সাথে সাথে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন বাংলা কবিতার শুরুর প্রহরটিকে।

মধ্যযুগীয় পর্বঃ

আদিপর্বের ছন্দ আলোচনায় স্পষ্ট যে শুরু থেকে বাঙালী কবিরা ছন্দের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, স্বরবৃত্ত এমন একটি ছন্দ যা যে কোনো ভাষার সৃষ্টিলগ্ন থেকে ছড়া শ্লোক গীত ইত্যাদির ভেতর দিয়ে অনায়াসে উৎসারিত হয়। ছন্দের বিকাশের ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে আদিপর্বেই অক্ষরবৃত্তের পয়ারগুলো দানাকৃত হতে দেখা যায়। পরবর্তীতে যদিও এর মাত্রা গণনা, পর্ববিন্যাস, রূপসজ্জায় বেশ পরিবর্তন ঘটে, তবুও এই ছন্দটি বাংলা কবিতার সাথে সর্বদাই দৃঢ় পায়ে হেঁটেছে। মধ্যযুগে এসে ক্রম-বিবর্তনের ভেতর দিয়ে যেমন অক্ষরবৃত্ত পূর্ণতা পেয়েছে ঠিক তেমনি বাংলার রূপরসগন্ধ অনুযায়ী একটি নরম ছন্দ মাত্রাবৃত্তকেও পরিস্ফুটিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। ভাষার দাবী অনুযায়ী এটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিলো। কারণ, অক্ষরবৃত্তের আট-ছয় এর চাল মাত্রাবৃত্তে ছয়-ছয়-দুই এ পরিণত হতে তেমন বেগ পাবার কথা নয়। যেমন,

অঝর ঝরএ মোর/ নয়নের পাণী

অক্ষরবৃত্তের আট-ছয় চালে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের এই পঙ্‌ক্তিটি অতি সহজে ভেঙে মাত্রাবৃত্তের ছয়-ছয়-দুই ফর্মে ফেলে দেয়া যায়।

অঝর ঝরএ/ মোর নয়নের/ পাণী

এটি সম্ভব হবার অন্যতম কারণ এই যে পঙ্‌ক্তিতে কোনো যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়নি; এবং শেষ শব্দটি এসেছে দুই মাত্রার। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতায় অক্ষরবৃত্ত থেকে মাত্রাবৃত্তে ঢুকে যাবার এই প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ:

১.
আকুল করিতেঁ কিবা কহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন।।
পাখী নহোঁ তাঁর ঠাই উড়ী পাড়ি জাঁও।
মেদনী বিদায় কেউ পসিআঁ লুকাওঁ।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।
(কে না বাঁশী বাএ বাড়ায়ি/ বড়ু চণ্ডীদাস)

পর্ববিন্যাস:

আকুল করিতেঁ কিবা/ কহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী/ নান্দের নন্দন।।
পাখী নহোঁ তাঁর ঠাই/ উড়ী পাড়ি জাঁও।
মেদনী বিদায় কেউ/ পসিআঁ লুকাওঁ।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি/ জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন/ কুম্ভারের পাণী।।

অক্ষরবৃত্তে (পয়ার) আট-ছয় এর অপূর্ব চালে মাত্র একটি প্রসারণ ও একটি সংকোচনের দেখা পাওয়া যায়। "কক্ষার" শব্দে "ক্ষ" সম্প্রসারিত, ও "বাড়ায়ি" শব্দে "ড়া" সংকুচিত হয়েছে। এই কাব্যাংশটুকুর বুননে অন্য কোথাও এই নিয়ম মেনে চলা হয়নি। অর্থাৎ এই পর্যায়ে এসে সব দীর্ঘধ্বনি ও হ্রস্বধ্বনি প্রসারণ-সংকোচন নিয়মটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকার প্রবণতা এসেছে। অন্যদিকে, একটু সতর্কতার সাথে দেখলে বোঝা যায় যে বেশ কয়েক পঙ্‌ক্তিতে চোরকাঁটার মতো মাত্রাবৃত্তের চাল ঢুকে গেছে। যেমন:

আকুল করিতেঁ/ কিবা কক্ষার/ মন।
...
পাখী নহোঁ তাঁর/ ঠাই উড়ী পাড়ি/ জাঁও।
মেদনী বিদায়/ কেউ পসিআঁ লু/ কাওঁ।।

মাত্রাবৃত্তে ছয়-ছয়-দুই এর চাল। প্রথম পঙ্‌ক্তির দিকে আরেকটু নজর দিলে, বলা অসঙ্গত নয় যে দীর্ঘধ্বনির সম্প্রসারণই অনেক ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্তে প্রবেশের দ্বার খুলে দিয়েছে।

২.
দরসন লোচন দীঘল ধাব।
দিনমনি পেখি কমল জনু জাব।।
কুমুদিনী চন্দ মিলন সহবাস।
কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাস।।
(বৈষ্ণব পদাবলী/ বিদ্যাপতি)

পর্ববিন্যাস:
দরসন লোচন/ দীঘল ধাব।
দিনমনি পেখি/ কমল জনু জাব।।
কুমুদিনী চন্দ/ মিলন সহবাস।
কপটে নুকাবিঅ/ মদন বিকাস।।

বিদ্যাপতির কাব্যের এই অংশটুকুতে তিন অক্ষরের শব্দ নিয়ে টানাটানির একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়। "লোচন", "দীঘল", "কপটে", "কমল" এবং "মিলন"—এই পাঁচটির প্রথম তিনটিকে সম্প্রসারণ করে চার মাত্রার মূল্য দেয়া হলেও, শেষ দু'টিকে দেয়া হয়েছে দুই মাত্রা ধারণ করার ক্ষমতা। অন্যদিকে চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে "কুমুদিনী চন্দ" কে আট মাত্রার মূল্য দেবার জন্যে দীর্ঘধ্বনি "নী" ও "ন্দ"কে দুই মাত্রা করে দেয়া হয়েছে। ফলতঃ এই কবিতায় সর্বত্র সংকোচন ও প্রসারণের ধরন এক নয়। সম্ভবত এই সময়ে এসে কবি খেয়ালের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। অবশ্য এটি হয়তো উচ্চারণের ধরণ বদলে যাবার ফলও হতে পারে।

৩.
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়াবি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।।
(রাধা-বিরহ/বিদ্যাপতি)

কাঠামো:
৬ + ৬
৮
৬ + ৬
৮

স্পষ্টত, এই কাব্যাংশটুকুতে যে সংকোচন-প্রসারণ ঘটেছে তা ওই তিন অক্ষরের শব্দকে ঘিরে। অর্থাৎ তিন অক্ষর সম্বলিত শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হ্রস্ব-ইকার যুক্ত শব্দকে হ্রস্বধ্বনি এবং শেষে ব্যবহৃত দীর্ঘ-ইকার যুক্ত শব্দকে দীর্ঘধ্বনি হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। ফলতঃ "তিমির", "অথির", "পাতিয়া" ও "মাতিয়া" এই চারটি শব্দর মাঝের মাত্রাটি ফেলে দিয়ে এদের প্রত্যেককে দেয়া হয়েছে দুই মাত্রার মর্যাদা। অন্যদিকে অন্ত্যে দীর্ঘ-ইকার সম্বলিত একমাত্র শব্দ "যামিনী"কে দেয়া হয়েছে চার মাত্রা।

৪.

নব নব গুণগুণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম হরম কোন ঠায়।।
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনো রথ জনি হয় অনুরত
পুছত গোবিন্দ দাস।।
(রূপে ভরল দিঠি/ গোবিন্দ দাস)

কাঠামো:

৮ + ৮
১০
৮ + ৮
১০
৮ + ৮
৮

এই কবিতাটি ৩ নম্বর উদাহরণে ব্যবহৃত বিদ্যাপতির মতোই, কিন্তু এখানে এই বুনন আট-আট-দশ এ পরিণত হয়েছে, যদিও শেষ পর্বটি একটু আলাদা। প্রসারণ ঘটেছে "বন্ধল" ও "অন্তরে" শব্দদ্বয়ে। এক্ষেত্রেও অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত প্রায় গলাগলি ঘরে হেঁটেছে, একমাত্র শেষ পর্ব—"পুছত গোবিন্দ দাস"—ছাড়া।

৫.

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।।
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী।।
(এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা/ চণ্ডীদাস)

বড়ু চণ্ডীদাস থেকে চণ্ডীদাসের সময়ের দূরত্ব প্রায় দুশো বছরের। এই সময় কালে আস্তে আস্তে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ একটি পরিপূর্ণ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। সংকোচেন-প্রসারণের আর কোনো দরকার যে হচ্ছে না, তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ চণ্ডীদাস রচিত উপরের কাব্যাংশটুকু। কি চমৎকার ছয়-ছয়-আট এর চাল! অন্যদিকে বলা যায়, "কলঙ্কের" আর "চণ্ডীদাস" শব্দ দু'টিকে বিযুক্ত অক্ষরের শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারলে, এই কাব্যাংশটুকু অনায়াসে মাত্রাবৃত্তের ছয়-ছয়-ছয়-দুই চালে ধরা দিতো।

৬.

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গে লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

...
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি করিতে পারি যত মনে উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।
(রূপ লাগি আঁখি ঝুরে/ জ্ঞানদাস)

পর্ববিন্যাস:

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে/ গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গে লাগি কান্দে/ প্রতি অঙ্গ মোর।।
...
রূপ দেখি হিয়ার আ/ রতি নাহি টুটে।
বল কি করিতে পারি/ যত মনে উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে/ কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি/ আউলাইছে গা।।

লক্ষ্য করার মতো যে প্রথম চার পঙ্‌ক্তি আট-ছয় চালে রচিত হলেও শেষ দুই পঙ্‌ক্তি রচিত হয়েছে আট-চার চালে। এটা একদিকে যেমন দুই-দুই লাইনে মাত্রার সমতা নির্দেশক, যেটা চর্যাপদ থেকেই ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে, অন্যদিকে স্বরের ওজন নির্ণয়ে অক্ষরবৃত্তে একটি আবশ্যকীয় নীতির সমর্থক। পূর্বে অক্ষরবৃত্তের নিয়ম থেকে আমরা জানি যে এই ছন্দে বদ্ধস্বরকে কখনো দুই এবং কখনো এক মাত্রা দেয়া হয়। সেই নিয়মে "আউলাইছে" শব্দে "আউ" ও "লাই" বদ্ধস্বর দু'টি প্রথম ও মাঝে অবস্থানের কারণে এক মাত্রা করে পেয়েছে; যেমন প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত "কান্দে" ও "অঙ্গ" শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে "কান" ও "অঙ" স্বরদু'টি এক মাত্রা করে ধারণ করেছে। অতএব "আউলাইছে"কে দেয়া হয়েছে তিন মাত্রার মর্যাদা। এই সময় থেকেই এই নিয়মের প্রচলন শুরু হয়। অবশ্য পরবর্তী কালে কেউ কেউ সব বদ্ধস্বরকে দুই মাত্রা দেয়ার পক্ষেও থেকেছেন।

৭.
পাশেতে বসিয়া রামা/ কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি/ পত্রের ছাওনী।।
ভেরেণ্ডার খাম তার/ আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে/ নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।
(ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ/মুকুন্দরাম)

৮.
মহা মহা মল্ল সব সিংহনাদ করে।
এথ দেখি এরাকের পৃথিম্বি বিদরে।।
সহস্র সহস্র বীর নাচে গদা ধরি।
যুদ্ধ মাঝে চলে হেন যেন মত্তকরী।।
পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ।
দিনে অন্ধকার নাহি রবির প্রকাশ।।
(রণাঙ্গনের দৃশ্য/ জয়েন উদ্দীন)

সাত ও আট এই দুই উদাহরণেই অক্ষরবৃত্তের (পয়ার) আট-ছয় এর চাল এসেছে নির্ভুল। অর্থাৎ দেখা যায় যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা কবিতায় পয়ারের আট-ছয় বুননটি নির্ভুল হয়ে গেছে। অবশ্য পাশাপাশি আরো একটি বুনন উঠে এসেছে আট-আট-দশ চালে, পরবর্তীতে (রোমান্টিক যুগে) যার প্রথম আট পড়ে গিয়ে মহাপয়ার নামে খ্যাত হয়।

আট-আট-দশ চালের দু'টি উদাহরণ:

৯.

মনোহর কণ্ঠ দেখি কম্বু হৈল মনোদুঃখী
জল মধ্যে করিল প্রবেশ।
বিবিধ রতণ-রাজ মোহন দোলরি সাজ
অপরূপ শোভিত বিশেষ।।

(লাইলীর রূপ/ দৌলত উজির বাহরাম খান)

১০.

হাতেম তাইর তরে, বিবি যে সওয়াল করে
শুনে হে হাতেম নেক মর্দ্দ।
লোক মুখে শুনা গেছে সে নাম জাহের আছে
নামেতে হাম্মাম বাদ গর্দ্দ।।

(হাসেন বানুর সাত সওয়াল/ সৈয়দ হামজা)

নয় ও দশ নম্বর উদাহরণ দু'টি শুধু যে আট-আট-দশ এর নির্ভুল চাল দেখিয়েছে তা নয়, মধ্যমিলের প্রবণতাটিও তুলে ধরেছে; পরবর্তীতে রোমান্টিক যুগে যার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় "শুধু বিঘে দুই ছিলো মোর ভূঁই আর সবই গেছে ঋণে/ বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন, ও-জমি লইবো কিনে" ইত্যাদি কবিতায়। দশ নম্বর উদাহরণে আরো লক্ষণীয় যে "সওয়াল" শব্দটির "ও" ধ্বনি কোনো মাত্রার মর্যাদা পায়নি, অনেকটা হ্রস্বধ্বনির সংকোচনের মতো। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় ছন্দেই কিন্তু এই ধরনের শব্দে এই ব্যবহারটি এখনও রয়ে গেছে যেমন, "হাওয়া", "খাওয়া", "নাওয়া", "যাওয়া" ইত্যাদি সব ছন্দেই দুই মাত্রা পায়।

ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে অক্ষরবৃত্তের আবর্তন থেকে মাত্রাবৃত্তের অঙ্কুরিত হওয়ার সময় ছিলো মধ্যযুগ। তবে স্বরবৃত্তের চালও অপ্রচলিত ছিলো না, যদিও তা গান শ্লোক ছড়া ইত্যাদিতেই প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ে স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ:

১১.

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী
এপার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে
সাঁতার নাহি জানি।

(বংশী-ধ্বনি/চাঁদ কাজী)

পর্ববিন্যাস:

ওপার হইতে/ বাজাও বাঁশী/
এপার হইতে/ শুনি।
অভাগিয়া/ নারী হাম হে/
সাঁতার নাহি/ জানি।

দুই মাত্রার অতিপর্ব রেখে স্বরবৃত্তের এই তিন পর্বের নির্ভুল পঙ্‌ক্তি রচনা করেন চাঁদ কাজী ষোড়শ শতাব্দীতে।

১২.

ধীরে ধীরে চল্যা কইন্যা নদীর ঘাটে আসি।

আইস্যা দেখে নদ্যার ঠাকুর বাজায় প্রেমের বাঁশি।।
('মহুয়া'/মৈমনসিংহ-গীতিকা)

পর্ববিন্যাস:

ধীরে ধীরে/ চল্যা কইন্যা/ নদীর ঘাটে/ আসি।
আইস্যা দেখে/ নদ্যার ঠাকুর/ বাজায় প্রেমের/ বাঁশি।।

যদিও মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সিংহ ভাগই অক্ষরবৃত্তের পয়ারে রচিত, তথাপি এর ভেতরেও স্বরবৃত্তের চাল খুঁজে পাওয়া যায়।

১৩.
বিন্দু নালে সিন্ধু বারি,
মাঝখানে তার স্বর্গগিরি
অধর চাঁদে স্বর্গপুরী,
সেই তো তিনি প্রমাণ জানায়।
দরশনে দুঃখ হরে,
পরশনে সোনা ঝরে,
এমন মহিমা সে চাঁদের—
লালন ডুবে ডোবে না তায়।।
(লালন ফকির)

পর্ববিন্যাস:

বিন্দু নালে/ সিন্ধু বারি,/
মাঝখানে/ তার স্বর্গগিরি/
অধর চাঁদে/ স্বর্গপুরী,/
সেই তো তিনি/ প্রমাণ জানায়।/
দরশনে/ দুঃখ হরে,/
পরশনে/ সোনা ঝরে,/
এমন মহি/ মা সে চাঁদের/—
লালন ডুবে/ ডোবে না তায়।।/

১৪.
আপনে চোরা আপন বাড়ী,
আপনে সে লয় আপন বেড়ী,
লালন বলে এ লাচাড়ি
কই না, থাকি চুপেচাপে।।
(লালন ফকির)

পর্ববিন্যাস:

আপনে চোরা/ আপন বাড়ী,/
আপনে সে লয়/ আপন বেড়ী,/
লালন বলে/ এ লাচাড়ি/
কই না, থাকি/ চুপেচাপে।/

দু'টি উদাহরণেই লালন ফকির লাইনে কোনো অতিপর্ব না রেখে আট পর্বের পঙ্‌ক্তি তৈরী করেছেন। অন্যদিকে তের নম্বর উদাহরণে 'দরশনে' ও 'পরশনে' শব্দদু'টি উচ্চারণ করা হয়েছে যথাক্রমে 'দরোশনে' ও 'পরোশনে'।

১৫.
আমি এমন জনম পাবো কিরে আর
এমন চাঁদের বাজার মিলবে কি আবার।।
(দুদ্দু শাহ্)

পর্ববিন্যাস:

আমি এমন জনম/ পাবো কিরে/ আর
এমন চাঁদের বাজার/ মিলবে কি আ/বার।।

লক্ষণীয়, প্রতি লাইনে দুই মাত্রার একটি করে উপপর্ব এবং একমাত্রার অতিপর্ব রেখেছেন দুদ্দু শাহ্। সম্ভবত স্বরবৃত্তে রচিত এই গানগুলিতেই প্রথম পয়ার ভাঙার কাজ করা হয়, যদিও ভাবের পূর্ণ সমাপ্তিতে দুই দাড়ির ব্যবহার স্পষ্ট।

ফলতঃ মধ্যযুগ শেষ হওয়ার আগেই ধ্বনি সংকোচন-প্রসারণ বিলুপ্ত হয়ে বাংলায় স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের একটি সুনির্দিষ্ট বুনন দাঁড়িয়ে যায়; মাত্রাবৃত্তও বেরিয়ে আসতে থাকে অক্ষরবৃত্তের শরীরের ভেতর থেকে। ক্লাসিক্যাল বা মহাকাব্যিক যুগে অক্ষরবৃত্ত পয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাবার সাথে সাথে মাত্রাবৃত্তের চরিত্র অনেকটা উন্মোচিত ও বিস্তৃত হয়।

ক্লাসিক্যাল পর্ব:

বাংলা কবিতায় ক্লাসিক্যাল বা মহাকাব্যিক যুগটি তেমন দীর্ঘ নয়। আনুমানিক ১৮৩০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যেই এর অবস্থান, অনেকাংশে মাইকেল মধুসূদন দত্তর (১৮২৪-১৮৭৩) জীবতকালই এ পর্বের সময় নির্ধারক। অথচ এই স্বল্প সময়েই বাংলা কবিতা বন্ধন মুক্ত হয়; পয়ারের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তৈরী করে অমিত্রাক্ষরের প্রবহমান দোলা। এতে যেমন লাইন শেষে দাড়ি পড়ার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়, তেমনি কবিতা পেয়ে যায় শক্ত গাঁথুনি। এই কালের উজ্জ্বলতম কবি মধুসূদন দত্ত হলেও, তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে অনায়াসে আলোচনায় নিয়ে আসা যায়। কারণ, নাটক রচনার নানা পর্যায়ে দীনবন্ধু নিজেও সফলতার সাথে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেছেন এবং মধুসূদনের মতোই মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের চালকে এগিয়ে নিয়েছেন।

১.
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।
(মেঘনাদবধ/মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

অক্ষরবৃত্তের আট-ছয় বুননে অন্ত্যমিল না রেখে, লাইন শেষে দাড়ি তুলে দিয়ে মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতাকে স্বাধীনতাই শুধু দিলেন না, একাধিক লাইন দিয়ে পঙ্‌ক্তি নির্মাণেরও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলেন। লাইন শেষে ভাবের পরিসমাপ্তি রহিত হওয়ায়, চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করার সুযোগ এলো। এই উদাহরণে কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি শেষ হয়েছে সাড়ে তিন লাইনে, যা মধ্যযুগে ছিলো কল্পনাতীত। অন্যদিকে ভাষাকে বেগবান করতে অনেক ক্ষেত্রে লাইনের অন্ত্য থেকে যতি চিহ্ন তিন অথবা চার মাত্রা দূরে সরিয়ে দিলেন, যেমন সপ্তম লাইনের শুরুতে ব্যবহৃত "অগণ্য" শব্দটি; পরবর্তী পঙ্‌ক্তি বা

পঙ্‌ক্তিখণ্ড একই মাপের শব্দ দিয়ে শুরু করলেন যেমন, "দেখিলা"। অর্থাৎ "অগণ্য। দেখিলা রাজা" তৈরী করলো একটি আট মাত্রার পর্ব, যদিও মাঝে একটি দীর্ঘচ্ছেদ পড়েছে।

২ক.
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
(মেঘনাদবধ/মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

খ.
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হেমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রজ-ছত্র মণিময় আভা...
(মেঘনাদবধ/মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

উদাহরণ ২(ক)-এর দ্বিতীয় লাইনে "নলিনী" শব্দটি আগের লাইনের সম্প্রসারণ, ছন্দের শুদ্ধতা রক্ষায় পরবর্তী পঙ্‌ক্তিখণ্ড শুরু হয়েছে "কূজনি" দিয়ে। উদাহরণ ২(খ)-এ একই রকম সম্প্রসারণের চিহ্ন পাওয়া যায় "হেমাসনে" ও "চারুনেত্রা" শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে।

৩.
কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা
বিষণ্ন হৃদয়ে করে দিবা বিভাবরী
যে জেনেছে সেই বিনা কে বলিতে পারে!
পূর্ণিমায় অন্ধকার; পূর্ণ সরোবরে
শুষ্ককণ্ঠে শীর্ণ মুখে মরে পিপাসায়;
সুখশূন্য সুলোচনা শূন্য মনে বসি
বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণী
দীননেত্রে নীরধারা বহে অবিরাম।
নারায়ণে সাক্ষী করি, আনন্দ আশায়
আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়।
যুবতীজীবন পতি সংসারের সার;
এবার একান্ত নিধি একান্ত আমার।
(কমলে কামিনি, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক/ দীনবন্ধু মিত্র)

মধুসূদন দত্তের ধ্রুপদী শব্দের ব্যবহারকে পাশ কাটিয়ে কবিতাকে মানুষের দৈনন্দিন ভাষার ভেতরে এনে দীনবন্ধু মিত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের অসাধারণ প্রয়োগ দেখিয়েছেন। অবশ্য শেষের চার লাইনে মিত্রাক্ষর বা অন্ত্যমিল রেখে নাটকের মাধুর্য বাড়ানোর চেষ্টায়ও ত্রুটি করেননি।

৪.
সেই পূর্ণ শশধরে, সেই রূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন।।
(শর্ম্মিষ্ঠা/ মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

আট-আট-আট-ছয় এর চাল। পাশাপাশি তিনটি আটমাত্রার পর্বে পরে একটি ছয় মাত্রার পর্ব জুড়ে একাধিক মধ্যমিল ও অন্ত্যমিলের ব্যবহারের সফল পরীক্ষাও করেছেন মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন দত্তের আরেকটি কালজয়ী সংযোজন হলো পেট্রারকান সনেটের আঙ্গিক। আট-ছয় এর চালে চোদ্দ লাইনের কবিতায় বিশেষ ধরনের অন্ত্যমিল ব্যবহার বাংলা ভাষায় এই প্রথম। যদিও এই ধরনের সনেট মধুসূদন দত্তের আবিষ্কার নয়, তথাপি তাঁর হাত ধরেই ইটালি থেকে বাংলায় এলো চোদ্দ লাইনের এই বুনন কৌশল। বাংলা কবিতা উত্তীর্ণ হলো একটি নতুন ধাপে। অন্যদিকে সমিল প্রবহমান পয়ার তৈরীর ক্ষেত্রে সনেটগুলো থাকলো মাইল ফলক হয়ে ।

৫.
কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি?
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী?

কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-দরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি!
(ঈশ্বরী পাটনী/মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

এই কবিতায় অন্ত্যমিলের ধরণ, কখখককখখক গঘগঘগঘ, যেটি পেট্রার্কান ধারার একটি নিখুঁত সনেট; একদিকে যেমন নতুন আঙ্গিকের সংযোজন, তেমনি স্বল্প পরিসরে কবিতাকে পক্ত করারও সফল প্রচেষ্টা।

অক্ষরবৃত্তই ছিলো ক্লাসিক্যাল পর্বের কবিতা রচনার প্রধান বাহন, তবে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে এ সময় বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়। কোথাও কোথাও অক্ষরবৃত্তের চালে মাত্রাবৃত্ত ঢুকে যাবার প্রবণতা একালেও পরিলক্ষিত হয়।

মাত্রাবৃত্তের চালঃ

৬.
কেনে এত ফুল তুলিলি স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হয়ে পরেকি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের মালা?
(মধুসূদন দত্ত)

কাঠামোঃ
৬ + ৬
৫

পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাবৃত্তের দু'টি করে ছয়মাত্রার পর্ব এবং পাঁচমাত্রার অতিপর্বের সুখকর চাল; উপরন্তু রাখা হয়েছে মধ্যমিল ও অন্ত্যমিল।

৭.
অথবা যেমন পাথরের দল মেজে
...
যেন বরে বেড়ে ফিরিতেছে সাত পাক।
(দীনবন্ধু মিত্র)

কাঠামো:
৬ + ৬ + ২

৮.
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে
রাধার রোদনধ্বনি দিও তারে লয়ে।
(দীনবন্ধু মিত্র)

কাঠামো:
৮ + ৮
৮ + ৬

আটমাত্রার তিনটি পর্ব এবং ছয় মাত্রার অতিপর্ব রেখে মাত্রারবৃত্তের একটি নিখুঁত পঙ্‌ক্তি।

স্বরবৃত্তের চাল:

৯.
এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি, তেমন্ আছে।
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন গিয়েছে।
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

পর্ববিন্যাস:

এখন কি আর/ নাগর তোমার/
আমার প্রতি,/ তেমন্ আছে।/
নূতন্ পেয়ে/ পুরাতনে/
তোমার সে য/তন গিয়েছে।/

১০.
লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর সীমন্তিনি?
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

পর্ববিন্যাস:

লোকে বলে/ রাধা কলং/ কিনী।
তুমি তারে/ ঘৃণা কেনে/ কর সীমন/ তিনি?

১১.
চেয়ে দেখ, প্রিয় সখি, কি শোভা গগনে!
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে!
(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

পর্ববিন্যাস:

চেয়ে দেখ,/ প্রিয় সখি,/ কি শোভা গ/ গনে!
ভ্রমিতেছে/ মন্দগতি/ প্রেমানন্দ/ মনে!

১২.
সোনার শেকল লোহার খাঁচা,
এর বেলাটি বিষম কাঁচা।
(দীনবন্ধ মিত্র)

পর্ববিন্যাস:

সোনার শেকল/ লোহার খাঁচা,/
এর বেলাটি/ বিষম কাঁচা।/

১৩.
হাতীর মাথায় মুক্তা থাকে,
বার করে লয় মানুষ তাকে।
(দীনবন্ধু মিত্র)

পর্ববিন্যাস:

হাতীর মাথায়/ মুক্তা থাকে,/
বার করে লয়/ মানুষ তাকে।/

এই ভাবে বিভিন্ন উদাহরণের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন ও প্রচলিত ছন্দের নানামুখি ব্যবহারে নাতিদীর্ঘ এই কালপর্বটি বাংলা কবিতাকে বিভিন্ন ভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

রোমান্টিক পর্ব

মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার রোমান্টিক যুগে কবিতার দিগন্ত খুলে দেয়। বিশেষত এই ছন্দের ছয় মাত্রার পর্ব দিয়ে এই যুগ নিয়ন্ত্রিত হলেও, চার পাঁচ ছয় সাত ও আট মাত্রার পর্বের চাল, স্তবক বিন্যাসের অভিনবত্ব, অন্ত্যমিল প্রয়োগের বিভিন্ন কৌশল বাংলা কবিতাকে শক্তিশালী করে তোলে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অক্ষরবৃত্তের আট-ছয় এর চালকে বর্ধিত করে আট-দশের চালে পরিণত করা, অর্থাৎ মহাপয়ার তৈরী, সময়ের দাবী মেটাতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে মাত্রাবৃত্তের চিরাচরিত মন্থরতায় অপূর্ব গতি সঞ্চারের মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম 'ভাষার-নাচন-তোলা'র মতো দ্যোতনা সৃষ্টি করেন। সংস্কৃত ছন্দের আদলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মন্দাক্রান্তা সহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাল সংযোজনও হয় এই পর্বে এসে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক স্বরবৃত্তকে ভাবগম্ভীর কবিতার শরীর নির্মাণে ব্যবহার করা, অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক এই ছন্দে বীর রসের সংযোজনও বাংলা কবিতাকে উল্লেখ করার মতো সমৃদ্ধি এনে দেয়।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দঃ

১.

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
(এবার ফিরাও মোরে/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সমিল প্রবহমান মহাপয়ার। আট-দশ এর এই বুননে লক্ষণীয় যে অন্ত্যমিল বিদ্যমান, অর্থাৎ পয়ারের অন্ত্যমিল আর অমিত্রাক্ষরের চলমানতা এই দুটিকে ধারণ করে প্রতি লাইনে সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত চারটি করে মাত্রা। পঞ্চম লাইনে অবশ্য দশ-আট এর পর্ব এসেছে, যা মহাপয়ারের অন্য একটি সিদ্ধ উপায়।

২.

দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ;...
(অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অমিল পবহমান মহাপয়ার। আট-দশ এর চালে কোনো অন্ত্যমিল না রেখে স্রোতের মতো বুনে গেছেন কবিতার লাইন। বেগ এসেছে ছন্দে।

৩.

...ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আছি সেই শ্যামবঙ্গদেশে
যেথা জয়দেব কবি কোন্ বর্ষাদিনে
দিখেছিলো দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।
(মেঘদূত/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সমিল প্রবহমান পয়ার। রোমান্টিক যুগ অন্ত্যমিলের যুগ, এখানে আট-ছয় এর চালে অন্ত্যমিল পাওয়া যায়। "শ্যামচ্ছায়া" শব্দটি দিয়ে বাক্য সম্প্রসারণ করার এই ধরণ আগেই লক্ষ্য করা গেছে মধুসূদন দত্তের কবিতায়। তবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসারণ ঘটিয়েছেন জোড় সংখ্যক মাত্রা দিয়ে; মধুসূদনের কালে বেজোড় সংখ্যক মাত্রায়ও যা অহরহ করা হতো।

৪.

বেদনা হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালীর মত শ্রভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
দল বৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম।
(দারিদ্র্য/কাজী নজরুল ইসলাম)

প্রবহমান সমিল পয়ারের এই বুনন রোমান্টিক কালের অনেক কবির ভেতরেই পাওয়া যায়। আট-ছয় এর চালে অন্ত্যমিল রেখে নজরুলও প্রচুর কবিতা রচনা করেন। অক্ষরবৃত্তের আরো বিচিত্র ব্যবহার এই সময়ের রচনায় চোখে পড়ে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ

মাত্রাবৃত্তের নানা রকম ব্যবহারে রোমান্টিক কাল পর্বটি হয়ে উঠেছে আলো-ঝলমল। যদি এভাবে বলা হয় যে রোমান্টিক যুগ মাত্রাবৃত্তের যুগ, তবে এতোটুকু অপলাপ হবে না। রোমান্টিক কবিতা ধীর লয়ের এক রকম মাদকতা তৈরী করে; অক্ষরবৃত্তের মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ না হয়ে মিষ্টি ভাষায় বিলম্বিত স্রোতের মতো এর চলা। আর সেই রোমান্টিক যুগের প্রাণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের হাতেই মাত্রাবৃত্ত বিচিত্র রকম শারীরীক অবয়ব ধারণ করে।

কথিত আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বউদিকে একদা বলেছিলেন যে তিনি বিহারীলালের মতো কবি হতে চান। সেই সময়কার পরিচিত কবি বিহারীলালকে অনুসরণ করা তরুণ রবির জন্যে অনুচিতও ছিলো না। এবং তিনি যে কাব্য বুননের ক্ষেত্রে কিছু কাল এই কবির স্মরণাপণ্য ছিলেন তার প্রমাণও পাওয়া যায়। বিহারীলাল যেমন মাত্রাবৃত্ত ঘেষা অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথেও শুরুর দিকে এই ধরণের কবিতার উদাহরণ রয়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর একটি কবিতা:

৫.
মধুর মদির স্বর
উঠিতেছে তর তর
আসিয়া নিঝর যেন উথলি উথলি ধায়
চারিদিকে সংগীতের কি এক মুরতি ভায়।
(প্রভাত/ বিহারীলাল চক্রবর্তী)

অক্ষরবৃত্তে পর্ব গঠিত হয়েছে আট মাত্রায়। কিন্তু "চারিদিকে সংগীতের" এই পর্বটি যুক্ত না হলে, কিম্বা "সংগীতের" শব্দটিকে "বাতাসের" অথবা "সুবাসের" এই জাতীয় একটি শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে কাব্যাংশটুকু মাত্রাবৃত্তে রচিত বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যেতো।

এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ করা যাক।

৬.
আকাশের পানে চাই সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।
(দৃষ্টি/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অবাক করার মতো হলেও একটি মাত্র শব্দ এই কাব্যাংশটুকুকে অক্ষরবৃত্ত করে রেখেছে। অক্ষরবৃত্তের আট-আট-ছয় চালের এই বুনন, যা মধ্যযুগেও প্রত্যক্ষ করা গেছে, অনায়াসে মাত্রাবৃত্তে ফেলে দেয়া যেতো যদি "অনন্তে" শব্দটিকে "অসীমে" অথবা "আকাশে" জাতীয় শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতো। তবে সুখের কথা হলো, *মানসী* কাব্যগ্রন্থের শেষ দিকে এসে রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্তের এই বাধা অতিক্রম করে পুরোপুরি মাত্রাবৃত্তে ঢুকে যান। জলের স্রোতের মতো প্রসারিত হতে থাকে মাত্রাবৃত্তের চাল।

৭.
ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে, পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্ম-মাঝারে করি যে বহন
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস।
(সুরদাসের প্রার্থনা/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মাত্রাবৃত্তের ছয় মাত্রার চালে এইসব পর্ব নির্মাণে অক্ষরবৃত্ত আর কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রতিটি বদ্ধস্বরই দুইমাত্রা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

৮.

নিশীথের তল হতে/ তুলি
লহো তারে প্রভাতের/ জন্য
আঁধারে নিজেকে ছিল/ ভুলি
আলোকে তাহারে করো/ ধন্য।
(শুকতারা/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আট মাত্রার পর্ব। লাইন শেষের অবস্থান ঠিক রেখে অতিপর্বে কখনো দুই কখনো তিন এসেছে।

৯.

গগনে গরজে মেঘ,/ ঘন বরষা
কুলে একা বসে আছি,/ নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান-কাটা হল সারা,/
ভরা নদী ক্ষুরধারা/ খরপরশা—
কাটিতে কাটিতে ধান/ এল বরষা।।
(সোনার তরী/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আট মাত্রার পর্ব ও পাঁচ মাত্রার অতিপর্ব রেখে কবিতাটি রচিত। এখানে অন্ত্যমিল ও মধ্যমিল বিন্যাসের অভিনবত্ব আছে।

১০.

বন্ধুর মুখ চাও,/ সখা হে যেথা যাও,/ দুঃখ দুস্তর/ তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ/ কহিয়ো কানে তার,/ হায়, বিলম্বের/ সময় নাই,
বৃন্তের বন্ধন/ আশাতে বাঁচে মন,/ হায় গো, বল্ তার/ কতই আর?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের/ তাপেতে সে শুকায়,/ যাও হে দাও তায়/ সলিল্-ধার।
(যক্ষের নিবেদন/ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

লাইনের শুরুতে আট মাত্রার একটি পর্বের পরেই সাত মাত্রার দু'টি পর্ব এবং শেষে পাঁচ মাত্রার একটি অতিপর্ব। বিশ শতকের শরুর দিকে এটি ছিলো সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি; অনেকটা সংস্কৃত মন্তাক্রান্তার মতো। তবে প্রথম পর্বটি সাত এর পরিবর্তে আট মাত্রায় রচিত। তাছাড়া প্রথম পর্বে চারটি করে বদ্ধস্বর রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই কবি বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সংস্কৃতের আদলে বেশ কয়েকটি ছন্দের নমুনা বাংলায় এনেছিলেন। সম্ভবত স্বরমাত্রিক ছন্দে প্রথম কবিতা তিনিই লেখেন। মাত্রাবৃত্তে ছয়-পাঁচ চালে কবিতা লিখে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন মঞ্জুশ্রী। তবে দুঃখের বিষয় কেবল মন্দাক্রান্তা ও স্বরমাত্রিক ছন্দ ছাড়া তার উদ্ভাবিত কোনো ছন্দই পরবর্তী সময়ের কবিরা তুলে নেননি। মন্দাক্রান্তা বিস্তার লাভ করেছে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় ছন্দে।

১১.

খাঁচার পাখি ছিল/ সোনার খাঁচাটিতে/
বনের পাখি ছল/ বনে।
একদা কি করিয়া/ মিলন হল দোঁহে,/
কী ছিলো বিধাতার/ মনে।
(দুই পাখি/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মন্তাক্রান্তায় রবীন্দ্রনাথ এখানে সত্যেন্দ্রনাথ রচিত প্রথম পর্বটি বাদ দিয়ে সাত মাত্রার বুনন নিয়ে এসেছেন। এটিই বাংলা কবিতায় পরবর্তী সময়ে ব্যাপকতা পেয়েছে।

১২.

রাখাল বলিয়া/ কারে করো হেলা,/ ও-হেলা কাহারে/ বাজে।
হয়তো গোপনে/ ব্রজের গোপাল/ এসেছে রাখাল/ সাজে।

(মানুষ/ কাজী নজরুল ইসলাম)

প্রতি লাইনে ছয় মাত্রার তিনটি করে পর্ব সংযোজিত হয়েছে।

১৩.

দিন যে ফুরালো,/ রবে না এ আলো,/ আসিছে নিশুতি/ রাতি—
সে আঁধারে সখী/ কেহ যে হবে না/ কাহারো বাসর/-সাথী।
নিশীথ আকাশে/ আসিবে যে তারা,/
চোখে চোখে শুধু/ করিবে ইসারা/
সে কি কৌতুকে/ মাতি—
এত প্রেম, প্রাণ/ সব নির্বাণ!/ শেষ এল সেই/ রাতি!
(দিনশেষে/ মোহিতলাল মজুমদার)

ছয় মাত্রার পর্ব। এই উদাহরণটি একটি দীর্ঘ কবিতার স্তবক। এ সময়ে দীর্ঘ কবিতায় একই রকম স্তবক বিন্যাসের প্রচলন ছিলো।

১৪.

চিত চুম্বন/-চোর-কম্পন/ [আমি] থর থর থর/ প্রথম প্রকাশ/ কুমারীর!
আমি গোপন প্রিয়ার/ চকিত চাহনি,/ ছল-ক'রে-দেখা/ অনুখন,
আমি চপল মেয়ের/ ভালোবাসা, তার/ কাঁকন-চুড়ির/ কন্-কন্।
আমি চির-শিশু চির-/ কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু/ পল্লীবালার/ আঁচর কাঁচলি/ নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু/ মলয়-অনিল/ উদাস পূরবী/ হাওয়া,
আমি পথিক-কবির/ গভীর রাগিণী/ বেণু-বীণে গান/ গাওয়া।
...
আমি তুরীয়ানন্দে/ ছুটে চলি, এ কি/ উন্মাদ আমি/ উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে/ চিনেছি, আমার/ খুলিয়া গিয়াছে/ সব বাঁধ!
(বিদ্রোহী/ কাজী নজরুল ইসলাম)

যে ছন্দটিকে মন্থর মনে করা হতো, তাতে এলো বেগ। এলো নাচের মুদ্রা। কলকল করে এই ভাবে যৌবনের ধ্বনি শোনালেন নজরুল তাঁর "বিদ্রোহী" কবিতায়। মাত্রাবৃত্তের ছয় মাত্রার চালে এলো নতুন জোয়ার। কখনো বা শোনা গেলো যুদ্ধের বাজনা। ভাষার নাচন ছাড়া একে আর কিই বা বলা যায়! অথচ লাইনের ভেতরেও গুঁজে দেয়া হলো উপপর্ব, যেমন "চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর থর থর প্রথম প্রকাশ কুমারীর!" এই পঙক্তির মাঝে ব্যবহৃত "আমি" শব্দটি দুই মাত্রার উপপর্ব যারা অন্যান্য লাইনের আগে বসেছে। অন্যদিকে কখনো চার, কখনো তিন, কখনো দুই মাত্রার অতিপর্ব আনা হয়েছে।

১৫.

চল্ চল্ চল্/
ঊর্ধ্ব গগনে/ বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা/ ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের/ তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে/ চল্।
চল্ চল্ চল্।/
(চল্ চল্ চল্/ কাজী নজরুল ইসলাম)

ছয়-পাঁচ এর বুনন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যার নাম দিয়েছিলেন মঞ্জুশ্রী, সেই দোলায় এবার এলো রণ-দামামা। কী সহজে বাজনার তালে তালে ছুটে এলো গগন বিদারী আওয়াজ!

১৬.
অতনু আকাশে/ যাঁর বিহার/
যাঁর প্রকাশ/ চিত্তে ভায়/
সবিতা বারতা/ বয় যাঁহার/
আজ প্রণাম/ তাঁর দু'পায়।/
(প্রণাম/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই আদি মঞ্জুশ্রীতে ছিলো চার পর্বের পঙ্‌ক্তি: ছয়-পাঁচ-পাঁচ-পাঁচ। প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে মুক্ত ও বদ্ধ স্বরের অবস্থান ছিলো একই সমান্তরালে।

১৭.
এই লভিনু/ সঙ্গ তব,/ সুন্দর হে/ সুন্দর!
পূণ্য হল/ অঙ্গ মম,/ ধন্য হল/ অন্তর,
সুন্দর হে/ সুন্দর!
(সুন্দর/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পাঁচ মাত্রার চাল, অতিপর্বে আছে চারমাত্রা।

১৮.
ভুলি কেমনে/ আজো যে মনে/ বেদনা-সনে/ রহিল আঁকা।/
আজো সজনী/ দিন রজনী/ সে বিনে গণি/ তেমনি ফাঁকা॥/
(গান/ কাজী নজরুল ইসলাম)

পাঁচ মাত্রার চাল। কোনো অতিপর্ব নেই। পঙ্‌ক্তিতে আছে চারটি করে পূর্ণ পর্ব।

১৯.
ক.
নিরজন/ নিদ্‌পুর/—
নিকেতন/ মৃত্যুর,/
বায়ু হায়/ মূরছায়/
ঢেউ নাই/ সিন্ধুর।/
(জিন/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

খ.
তুমি বল/—"আমি হায়/
ভালবাসি/ মাটি-মায়,/
চাই না এ/ অলকায়/
ভালো এই/ পথ ভুল।"/
(ঝিঙে ফুল/ কাজী নজরুল ইসলাম)

চার মাত্রার পর্ব। প্রতিলাইনে দু'টি করে পর্ব এসেছে। কোনো অতিপর্ব নেই। মাত্রাবৃত্তে এই ধরনের কবিতাকে আট মাত্রার পর্ব বলে মনে হয়। এই চাল সাধারণত ছড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্বরবৃত্ত ছন্দঃ

স্বরবৃত্ত প্রধানত চার মাত্রার পর্ব গঠন করে। বিশেষ উপায়ে এটাকে কেবল সাতমাত্রার পর্বে উত্তীর্ণ করা যায়। লাইনে পর্ব সংখ্যা এবং অতিপর্বে মাত্রা সংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপপর্ব রেখে এই ছন্দে বিভিন্ন ধরণের শ্রুতি-ব্যঞ্জন গড়ে তোলা হয়েছে। এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ভাবগাম্ভীর্যময় কবিতা আর কাজী নজরুল সংযোজন করেছেন বীর রস।

২০.
এইতো তোমার আলোক-ধেণু সূর্যতারা দলে দলে—
কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগন-তলে।
(আলোক ধেণু/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চারটি করে পর্ব, কিন্তু কোনো অতিপর্ব নেই।

২১.
তুই কি ভাবিস দিনরাত্তির খেতে আমার মন?
কক্ষনো তা সত্যি না মা, আমার কথা শোন!
(খেলাভোলা/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তিনটি করে পর্ব এবং একমাত্রার একটি অতিপর্ব সংযোজিত হয়েছে।

২২.
একটা কি সুর গুনগুনিয়ে কখন আমার বাজে
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার কথার মাঝে।
(মনে-পড়ে/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লাইনে তিনটি করে পর্ব এবং দুইমাত্রার অতিপর্ব সংযোজিত হয়েছে।

২৩.
নেইকো দ্বন্দ্ব দু'ইচ্ছাতে,—
নেইকো লোকের নিন্দাভয়।
—হাস্‌ছ? হাস। কিন্তু প্রিয়ে
করব বিয়ে সুনিশ্চয়।
(ফুল-সাঞ্চি/ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

তিনটি করে পর্ব এবং তিন মাত্রার অতিপর্ব সংযোজিত হয়েছে।

২৪.
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
...
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,...
(আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে/ কাজী নজরুল ইসলাম)

পর্ববিন্যাস:

আজ সৃষ্টি-সুখের/ উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর/ চোখ হাসে মোর/ টগবগিয়ে/ খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের/ উল্লাসে।
...
গগন ফেটে/ চক্র ছোটে,/ পিনাক-পাণির/ শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর/ উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে/ উল্টাতে,...

স্বরবৃত্তে এখানে বীর-রস এসেছে। এসেছে বাঁধ ভাঙার আওয়াজ। লাইনে এসেছে অসম পর্ব, এবং রাখা হয়েছে একমাত্রার উপপর্ব ও তিনমাত্রার অতিপর্ব।

২৫.
মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল!
...
মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
(ছাত্রদলের গান/ কাজী নজরুল ইসলাম)

আছে উপপর্ব এবং অতিপর্ব। এখানে এসেছে রক্তে আগুন লাগা সময়ের ডাক। স্বরবৃত্তে লেগেছে বীরত্বের ছোঁয়া।

২৬.
পুকুরের ওই কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না,
হোতা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে যেই চ'ড়েছি
ছোট এক ডাল ধ'রেছি
ও বাবা মড়াৎ করে
প'ড়েছি সড়াৎ জোরে!
(লিচু-চোর/কাজী নজরুল ইসলাম)

সাত মাত্রার একটি করে পর্ব দিয়ে গঠিত হয়েছে প্রতিটি লাইন। এটি স্বরবৃত্তে মন্দাকান্তা ছন্দের উদাহরণ।

স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই তিন প্রকার ছন্দই রোমান্টিক কালপর্বে ব্যবহৃত হয়ে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। লাভ করেছে নানামুখি বিস্তৃতি। তথাপিও এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সবচে বেশী চলেছে মাত্রাবৃত্তের চাল।

মাত্রাবৃত্ত একদিকে যেমন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা ও শান্ত স্রোতের মহিমা দিয়েছে, অন্যদিকে দিয়েছে রক্তে চাঞ্চল্য ও ঝড়ের তিব্রতা।

আধুনিক ও উত্তরাধুনিক পর্ব

কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতাই রোমান্টিক যুগের শান্ত সৌম্য স্রোত থেকে বেরিয়ে এসে নতুন বেগবান তরঙ্গ হিল্লোল তোলার প্রথম প্রয়াস। যদিও রোমান্টিক যুগের অধিক ব্যবহৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই কবিতাটি নির্মিত, তথাপি এর স্তবক বিন্যাস ও পঙ্‌ক্তি নির্মাণ মাত্রাবৃত্তে সমিল মুক্ত ছন্দের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর ভেতরের দোলা, ভাষার অপূর্ব নাচন বাংলা কবিতা আগে প্রত্যক্ষ করেনি। তবে স্পষ্টত, রোমান্টিকতার বলয় ভাঙার আভাস তৈরী করতে পারলেও নজরুল ছিলেন আপাদমস্তক রোমান্টিক কবি। তিনি শুধু সঞ্চার করেছেন সাহস, দিয়েছেন নতুন পথের সন্ধান।

আলোচনার সুবিধার্থে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কিছুটা ভিন্নতা থাকার কারণে আধুনিক কালপর্বকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেই ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী—এই পাঁচ কবি আধুনিক কবিতার প্রথম স্রোতের একত্রিত প্রধান। এঁরা প্রত্যেকেই ছন্দ নিয়ে বিস্তর কাজ করেছেন; অন্ত্যমিলের ধরণ নিয়ে চালিয়েছেন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা (তেরসা রিমা, স্পেনসরিয়ান রাইম—মূলত জীবনানন্দে); স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নানামুখি ব্যবহারে ও দৈনন্দিন শব্দবন্ধের উৎসারণে নির্মাণ করেছেন বিচিত্র ধরনের কবিতা। সমৃদ্ধতর হয়েছে সনেটের অঙ্গন। তিন প্রকার ছন্দেরই মুক্ত রূপের বিকাশ ঘটেছে; যদিও অক্ষরবৃত্তের মুক্ত রূপের ব্যবহার পেয়েছে অধিক গুরুত্ব। ছন্দের প্রতিষ্ঠিত চালেও এ সময় অসংখ্য কবিতা রচিত হয়েছে।

১.
তাদের পদাঙ্ক মুছে গেছে রৌদ্রে, ধারাপাতে ঝড়ে;
যুগান্তরে
তোমার স্মৃতিও, জানি, সেই মতো হারাবে ধূলায়।

তবু চায় প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম।
(নাম/সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

সমিল অক্ষরবৃত্তের এই মুক্ত রূপে আট-দশ চালের ঝোক থাকলেও, চার ছয় বারো ইত্যাদি জোড় সংখ্যক মাত্রার পর্ব দেখা যায়।

২.
মানুষের হৃদয়কে না-জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল ব'লে
আজ তার মানবকে কি ক'রে চিনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনো বিশৃঙ্খল।
(জনান্তিকে/ জীবনানন্দ দাশ)

অমিল অক্ষরবৃত্তের মুক্তরূপের এই চাল যাকে আমরা অন্যত্র নঞ ছন্দ বলে উল্লেখ করেছি, আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায় পুরোপুরি শাসন করে চলে।

এই পর্যায়ের কবিরা যেমন শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও হুমায়ুন আজাদ প্রত্যেকেই বিপুল ভাবে চর্চা করেছিলেন অমিল অক্ষরবৃত্তের মুক্তরূপের। যদিও স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মূল ধারায়ও চর্চা অব্যহত ছিলো, তথাপি মুক্তছন্দের বিকাশ দিগন্ত স্পর্শ করেছে।

৩.
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা,
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল,
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
(স্বাধীনতা তুমি/ শামসুর রাহমান)

মাত্রাবৃত্তে অমিল মুক্তছন্দের ব্যবহারে এখানে ছয় মাত্রার চাল আনা হয়েছে। অথচ কবিতাটি গদ্যের মতো পড়ে যেতেও কোনো অসুবিধা হয় না। তাই কখনো কখনো ছন্দের এই ধরনকে গদ্যছন্দও বলা হয়।

৪.
যেদিকে ইচ্ছে পালাও দু'পায়ে, এইটুকু থাক জানা;
চারিদিকে আমি
কাঁটাতারে ঘিরে সান্ত্রী বসিয়ে পেতে আছি জেলখানা।

কুকুর যেমন সব-ক'টি দাঁতে গেঁথে রাখে প্রিয় মাংস,
গেঁথে রাখি দাঁতে
তোমার শরীর এবং রূপের আধা-আর-উর্ধ্বাংশ।
(প্রেম/হুমায়ুন আজাদ)

মাত্রাবৃত্তে সমিল মুক্তছন্দ। এখানেও ছয় মাত্রার চাল পরিলক্ষিত হয়।

৫.
সামান্য হয়
তাঁর পূজাতে নষ্ট সময়
এবং তিনি
আমার চেয়ে ভালোবাসেন তরঙ্গিণীর
দু-হাত ফাঁকা, রক্তে মাখা ওষ্ঠ, করুণ—
চায় না ক্ষমা তরঙ্গিণী পাপের দরুণ।
(মন্দিরে ওই নীল চূড়া/শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

স্বরবৃত্তে সমলি মুক্তছন্দ। রোমান্টিক যুগেও এমন সমিল মুক্তছন্দের প্রয়াস দেখো গেছে নজরুলে "সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে" কবিতায়।

৬.
কারুর দিকে হাত বাড়ালেই হাত সরে যায়
দুঃখভেজা মেঘ-আড়ালে
যখন-তখন

মনের আপন ঘাঁটি ভীষণ প্রকম্পিত।
এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা
শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি।
(এখন আমি/ শামসুর রাহমান)

অমিল স্বরবৃত্তের মুক্তরূপ। এখানে বলে রাখা ভালো যে রোমান্টিক যুগে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম, আধুনিক পর্বে প্রথম পর্যায়ে যেমন জীবননান্দ দাশ (মূলত অক্ষরবৃত্তে), ঠিক তেমনি আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ে শামসুর রাহমান তিন প্রকার ছন্দেই অসংখ্য কাজ করেছেন; আদিরূপ এবং মুক্তরূপ উভয় শাখায়। আধুনিক কবিতার উৎকর্ষে ছন্দ নিয়ে আর যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাঁরা হলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সৈয়দ শামসুল হক, শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আবু হাসান শাহরিয়ার প্রমুখ।

উত্তরাধুনিক কালপর্বেও কবিতার ছন্দ নিয়ে নানা রকম কাটাছেঁড়ার চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান সবগুলো ছন্দের চর্চাই এ সময়ে হয়েছে। অক্ষরবৃত্তের মুক্ত রূপে কেউ কেউ দৈনন্দিন শব্দের সাথে ক্লাসিক্যাল শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সনেটের আঙ্গিক নিয়েও কাজ হয়েছে; এবং সে ক্ষেত্রে নতুন স্তবক বিন্যাস ও অন্ত্যমিলের অভিনবত্ব একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে এই কালপর্বে অক্ষরবৃত্তের অমিল মুক্তরূপ বা নঞ ছন্দই কবিতা রচনার একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে ধরা দিয়েছে।

চর্যাপদ থেকে উত্তরাধুনিক সময় পর্যন্ত বাংলা কবিতার ছন্দের চর্চা ও উৎকর্ষ নিয়ে বিশদ পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে একথা প্রতিয়মান হয় যে বাংলা ভাষার কবিরা সর্বদাই ছন্দ সচেতন ছিলেন এবং এর উদ্ভাবনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে রেখেছেন কার্যকরি ভূমিকা। দেখা গেছে যে মধ্যযুগ পার হওয়ার আগেই বাংলা তিন প্রকার ছন্দ সুগঠিত রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে। যদিও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় রোমান্টিক যুগে তথাপি ক্লাসিক্যাল যুগে এই ছন্দটি যে স্পষ্ট দানা বেধেছে তাঁর প্রমাণ মাইকেল মধুসূদন দত্তের *ব্রজঙ্গনা* গ্রন্থের "কুসুম" কবিতার কয়েকটি স্তবক। স্মর্তব্য, এর পরেও মাত্রাবৃত্তের শরীরে অক্ষরবৃত্তের যে উপস্থিতি লুকিয়ে ছিলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন তাঁর *মানসী* কাব্যগ্রন্থের শেষ পাদে এসে। ফলতঃ ধারাবাহিক ভাবে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে স্বরবৃত্ত ছন্দ বিরাজিত ছিলো বাংলা ভাষার উৎপত্তির কাল থেকে গীত, স্বগতোক্তি, ছড়া, শ্লোক ইত্যাদির ভেতর দিয়ে, অক্ষরবৃত্ত ছিলো সর্বদাই আসন গেড়ে, আর মাত্রাবৃত্ত বেরিয়ে এসেছে অক্ষরবৃত্তের শরীর ফুঁড়ে।

চর্যাপদের সময়টি ছিলো স্বরবৃত্ত ও কথ্য ভাষা এবং প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণে নতুন ছন্দ মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তির কাল। মধ্যযুগে আট-ছয় পয়ারের চালে অক্ষরবৃত্ত পরিশুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ওর শরীরের ভেতর দিয়েই দানা বেঁধে ওঠে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। ক্লাসিক্যাল বা মহাকাব্যিক যুগে অমিত্রাক্ষর রীতির উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাংলা কবিতা পায় স্বাধীনতার সাধ; এই পর্বে সনেট সংযোজিত হওয়ায় অন্ত্যমিল বিন্যাসের নতুনত্ব দেখা যায়। রোমান্টিক যুগ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সহজ বিকাশের ক্ষেত্র উন্মোচিত করার পাশাপাশি ছন্দে বিপুল গতির সঞ্চার করে মুক্তছন্দের দিকে ধাবিত হয়। আধুনিক কালে এই মুক্তছন্দই "আমি" বা ব্যক্তির সংসর্গে নতুন জোয়ার তুলে ছুটে যায় দিকে দিকে; ছন্দের প্রচ্ছন্ন বুনন রেখেও কবিতা হয়ে ওঠে মানুষের দৈনন্দিনতার প্রতীক, যা কথা বলার ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে গদ্যের কাছাকাছি চলে আসে। উত্তরাধুনিক কালেও চলে এর সম্প্রসারণ।